সমকাল

তারিখ 01 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর ছিন্নতন্ত্রী বীণার সুর

উচ্চশিক্ষা

ড. নাদির জুনাইদ

অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রায়ই গণমাধ্যমে নেতিবাচক প্রতিবেদন দেখতে পাই। শিক্ষক নিয়োগে নিয়ম না মানা, শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব, শিক্ষকদের গবেষণায় অপরের রচনা চুরির নজির, যৌন হয়রানির অভিযোগ, হলে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ছাত্রদের হাতে সাধারণ ছাত্রদের প্রহৃত হওয়া, পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা, পরীক্ষায় ঢালাওভাবে বেশি নম্বর দেওয়া, গবেষণার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রভাব প্রাপ্তির প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার পর শিক্ষকদের আর দেশে না ফেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সময় না দিয়ে শিক্ষকদের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা, অনেক বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া প্রভৃতি অনিয়ম আর অভিযোগ নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রতিবেদন। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নিয়মিত নেতিবাচক সংবাদ দেখার পর বহু মানুষের মনে বিষাদ আর হতাশা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। কবি সমর সেন বলেছিলেন, কলকাতা শহরে হতাশা যেন বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশেও বিভিন্ন দশকে সামাজিক আর রাজনৈতিক অন্যায় যেভাবে বহু মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে তাতে মনে হয় আমাদের দেশেও হতাশাগ্রস্ত হওয়া হয়তো বাধ্যতামূলক ব্যাপারেই পরিণত হয়েছে। এমন পরিবেশে আশা হয়ে টিকে থাকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, যেখানে জ্ঞান, যুক্তি আর রুচিশীলতার চর্চা মঙ্গলময় একটি ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু গণমাধ্যমের বিভিন্ন সংবাদ তো মানুষকে এমন বার্তাই প্রদান করছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলো আর দৃশ্যমান নয়, সেখানে দ্রুত বাড়ছে আদর্শহীনতার অন্ধকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে শিক্ষার মানের এবং শিক্ষকতার আদর্শের যে অসাধারণ উৎকর্ষ ছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারায় ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার যে প্রবণতা ক্রমে বেড়েছে তা ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করেছে অনেক মানুষের চেতনা। ১৯৭৬ সালে সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে এক আলাপে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক মন্তব্য করেছিলেন : 'অতীতে কোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে শিক্ষকদের মধ্যে যে লজ্জাবোধ দেখতাম, তা এখন আর একেবারেই দেখি না। কিন্তু এটা তো কেবল ইউনিভার্সিটিরই বৈশিষ্ট্য নয়। এই ধরনের মানসিকতা তো আগে দেখা যায় পুরো সমাজেই। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন মানসিকতা চোখে বেশি ঠেকে। সমাজে ন্যায়পরায়ণতা এবং নীতিবোধের যে মান বিরাজমান সমাজের মধ্যে অবস্থানরত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চেয়ে উঁচু মান টিকে থাকবে এমন আশা বাস্তবধর্মী নয়। সমাজে কোন ধরনের মূল্যবোধের চর্চা চলছে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশে তা কেবল আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।' (সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, সাহিত্য প্রকাশ : ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪৩)।

বদলে যাওয়া জীবনধারার প্রভাবেই যে মানুষের চেতনা কখনও অধঃপতিত হয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সে কথাই বলেছেন। মানুষের চেতনায় সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের কথা বলেছিলেন কার্ল মার্কসও। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বর্তমান সময়ের রাজনীতিতেও কি আমরা তেমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর প্রস্তুতি দেখতে পাই যে আদর্শ, নীতিনিষ্ঠতা আর পরিশ্রম আমরা দেখেছি অতীতে বাংলাদেশের বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের মধ্যে? সমাজে যদি অবক্ষয় চোখে পড়ে তাহলে বর্তমান ভোগবাদী সময়ে কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে আদর্শবাদিতার গুরুত্ব মানুষকে অনুধাবন করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেই প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতি আর অনিয়ম ঘটলে সে সম্পর্কে গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশিত হতেই হবে। এর ফলে এমন অন্যায় যেন আর না ঘটে সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। চাঞ্চল্যকর, অপরাধ বা দুর্ঘটনাজনিত এবং মুখরোচক সংবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু গণমাধ্যমে এমন সংবাদ বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হলে সমাজের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে না। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনে উত্তেজনাপূর্ণ উপাদানের আধিক্য বা নিয়মিত উপস্থিতি মানুষের মন অস্থির, অশান্ত, আক্রমণাত্মক করে তোলে।

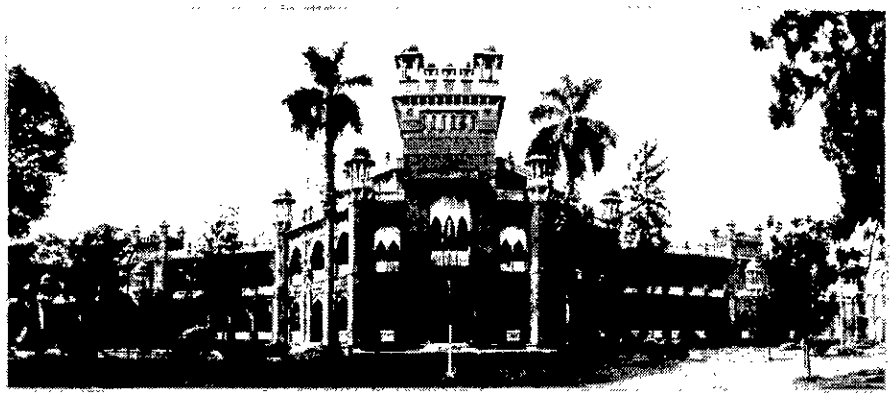

বলা হতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের গবেষণা করা তাই খবর নয়, বরং গবেষণার আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে সেটাই খবর। এমন বক্তব্যের বিপরীতে গণমাধ্যমের অন্যতম একটি দায়িত্ব যে পাঠক-দর্শককে শিক্ষাদান করা সে কথাটি স্মরণ করতে হয়

গণমাধ্যমে তাই চাঞ্চল্যকর আর মুখরোচক সংবাদের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি সমাজে সুরুচি সৃষ্টিতে সাহায্য করবে না। সমাজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দীপ্তিময়, গঠনমূলক, চিন্তাঋদ্ধ দিকের উপস্থিতিও আছে। প্রশ্ন করতে হয়, সেই সংবাদগুলো কতটা আগ্রহ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে?

বলা হতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের গবেষণা করা তাই খবর নয়, বরং গবেষণার আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে সেটাই খবর। এমন বক্তব্যের বিপরীতে গণমাধ্যমের অন্যতম একটি দায়িত্ব যে পাঠক-দর্শককে শিক্ষাদান করা সে কথাটি স্মরণ করতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের গবেষণাধর্মী কাজ দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থাগুলো বই হিসেবে প্রকাশ করছে। তাদের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক জার্নালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সেমিনারে এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা নিয়মিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে চিন্তাসমৃদ্ধ বক্তব্য দিচ্ছেন। চিন্তাশীল কাজ আর বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গণমাধ্যমে প্রচার করা না হলে আমরা কি আশা করতে পারি গভীর ভাবনার প্রতি মানুষের আগ্রহ তৈরি হবে? কিন্তু গণমাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার কথা, কোন কোন শিক্ষক নিজ বিষয়ে কী নতুন ভাবনা উপস্থাপন করলেন তা কতটা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়? বিভিন্ন সেমিনারে শিক্ষক-ছাত্রদের অ্যাকাডেমিক বক্তব্য আর আলোচনা শোনার জন্য ক'জন সাংবাদিক উপস্থিত থাকেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে কেবল তা খুঁজে দেখলেই তো চলবে না, কোথায় নিয়মিত আলো দেখা যাচ্ছে আর সেই ঔজ্জ্বল্যের রূপ কেমন গণমাধ্যম কর্মীদের তো তা প্রচার করার আগ্রহও থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নির্বাচনের প্রার্থী কারা, কারা নির্বাচনে জিতল প্রভৃতি খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। গণমাধ্যম প্রতিবেদনের কারণে কোন শিক্ষক কোন দল করেন, কাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান সমাজের মানুষ তা জানে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকরা কোন গুরুত্বপূর্ণ স্কলারশিপ নিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন, তাদের প্রকাশিত বই কী কী এবং সেসব কাজ কীভাবে নতুন জ্ঞান তুলে ধরেছে তা কি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে মানুষকে জানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে? প্রশ্ন তৈরি হয়, গণমাধ্যমে এবং সমাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দিকগুলো বেশি প্রাধান্য পায়? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রদের উঁচু মানের গবেষণা করার জন্য যথেষ্ট বই, জার্নাল এবং অন্যান্য গবেষণা উপাদান নেই। নতুন বই কেনার জন্য বরাদ্দও সীমিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারে কোনো বই বা জার্নাল না থাকলে গবেষকদের জন্য অন্য দেশের গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় বই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার করে আনার ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এমন সুযোগ এখনও নেই। আমি যখন ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়া সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য পড়ালেখা করছিলাম তখন দেখেছি সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারদেরও নিজস্ব অফিসকক্ষ আছে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিজের বিভাগে দেখেছি বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষক অধ্যাপক ক আ ই ম নূরউদ্দিন তার চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত কলা ভবনের একটি ছোট অফিসকক্ষে আরেকজন প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে বসেছেন। একই মাপের আরও কয়েকটি কক্ষ দু'জনে ভাগ করে ব্যবহার করতেন অন্য প্রবীণ অধ্যাপকরা। সেই ছোট কক্ষগুলোতে দু'জন শিক্ষকের দরকারি বই রাখার মতো যথেষ্ট জায়গাও নেই। সেই কক্ষগুলোতে এখন বসেন অন্য প্রজন্মের শিক্ষকরা। পুরনো টেবিলগুলোই মেরামত করে ব্যবহার করা হয় কারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন চেয়ার-টেবিল কেনার জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তাতে বর্তমান বাজারে ভালো মানের কোনো টেবিল কেনা যায় না। বিদেশ থেকে পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরে আমি দুই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নিজস্ব অফিসকক্ষ পাইনি। প্রায়ই দেখি নিজের এবং অন্য বিভাগের সহকর্মীরা বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন এবং বসার জন্য অফিসকক্ষ পাচ্ছেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের ক্যাম্পাসে থাকার মতো বাড়ি নেই। উত্তরা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যাতায়াতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি মাইক্রোবাস আছে। সেদিন আমার এক সহকর্মী বলছিলেন, কখনও একটি গাড়ি জ্যামের জন্য বা নষ্ট থাকার কারণে সঠিক সময়ে না পৌঁছলে একটি গাড়িতেই শিক্ষকদের ঠাসাঠাসি করে বসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরতে হয়। ১৬ কোটি মানুষের দেশে এই শিক্ষকদের মতো দেশ-বিদেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করা মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষকদের কাজের আর গবেষণার বিভিন্ন অসুবিধার কথা কি সংবাদপত্রে তুলে ধরা হয়? রাষ্ট্রই বা কতটা সচেতন তাদের এমন অসুবিধা সম্পর্কে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন না। বিদেশে পড়তে গিয়ে সবাই সেখানে থেকে যান না। সব বিভাগেই আলাদা সান্ধ্যকালীন কোর্স নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বিভিন্ন অসুবিধার পরও নিভৃতে নিমগ্নভাবে জ্ঞানচর্চা করে যাচ্ছেন। তাদের ক্লাসই ছাত্রছাত্রীদের কাছে হয়ে ওঠে উপকারী আর আকর্ষণীয়। তাদের কথার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় যুক্তি আর প্রজ্ঞার সৌন্দর্য। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী কলকাতায় ষাট-সত্তর বছর আগের শিক্ষকদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'অনেকে সারা জীবন গবেষণা তথা শাস্ত্রচর্চায় কাটাতেন। কিন্তু তাঁদের ছিন্নতন্ত্রী বীণার সুর কারও কানেই পৌঁছাত না। এঁরা গবেষণা করতেন জীবনের প্রয়োজনে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়।' (তপন রায়চৌধুরী, বাঙালনামা, আনন্দ পাবলিশার্স : ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৩৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও এমন শিক্ষক আছেন, যারা নিজেদের মনের গভীর তৃপ্তির জন্য একাগ্রচিত্তে লেখাপড়া করে যাচ্ছেন। শিক্ষক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। নিভৃতে থাকা এসব মানুষের বীণার সুর হয়তো এই প্রচারনির্ভর, জাঁকজমকপূর্ণ আর ভোগবাদী চেতনাসর্বস্ব সময়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কিন্তু এসব মানুষের জন্যই টিকে থাকে শিক্ষকতার আদর্শ। তাদের গভীর গবেষণা, সযত্নে শিক্ষাদানের মাধ্যমে সৃষ্ট মননশীলতা আর মনীষা সমাজকে এগিয়ে নেয় শুভ বোধের দিকে। তাদেরকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকিত দিকগুলো জানার চেষ্টা করাও তাই জরুরি, সমাজের মঙ্গলের জন্যই।